আর্য্যকীর্ত্তি।—নং ২

শিখ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

(গত ৩০এ মার্চ্চ সিটী কলেজ-গৃহে পঠিত)

কলিকাতা

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৩

মূল্য ৶৹ তিন আনা।

পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ।

আর্য্যকীর্ত্তি।—নং ২

শিখ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

(গত ৩০এ মার্চ্চ সিটী কলেজ-গৃহে পঠিত)

কলিকাতা

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৩

বিজ্ঞাপন।

সিটী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে গত ৩০এ মার্চ্চ আমি উক্ত কলেজ-গৃহে শিখদিগের উৎপত্তি ও উন্নতির সম্বন্ধে যে বক্তৃতা পাঠ করি, তাহা এখন কিয়দংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আর্য্য-কীর্ত্তির কাহিনী একবার পড়িয়া দেখিলেই আমি চরিতার্থ হইব।

এই স্থলে আমি সিটী কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি উৎসাহ না দিলে, বোধ হয়, এই বক্তৃতা প্রচারিত হইত না।

কলিকাতা।
১৮ই বৈশাখ, ১২৯০

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শিখ।
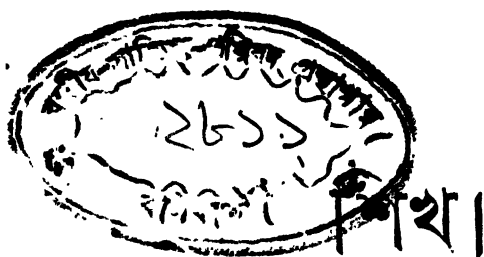
শিখদিগের বিবরণ জাতীয় ইতিহাসের একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যখন ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে দৃঢ়তর আবদ্ধ, তখন কে মনে করিয়াছিল, সেই পরাধীনতার সময়ে ভারতের একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিষয়-নিস্পৃহ তপস্বীর ন্যায় ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরিশেষে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে? যে সলিল-রেখা আজ একটী সূক্ষ্ম রজত-মালার ন্যায় পৃথিবীর দেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল, কে মনে করিয়াছিল কাল তাহা ভীষণ আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া অনন্ত জীবলোকের শক্তিকে উপহাস করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইবে, এবং আপনার ক্ষমতায় আপনিই উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গবাহুর আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? কালের পরাক্রমে শিখ-সম্প্রদায়ে এইরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। লোকে প্রথমে যাহাকে বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে একবার চাহিয়াও দেখে নাই, কালে সে সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ-ওয়াটার্লু-বিজয়ী ব্রিটীশ তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কিরূপ অবস্থা ছিল, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। রোমক সাম্রাজ্যের পতন অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনা-সমূহ রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে মুসলমানেরা উদ্বেল সাগরের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহু পূর্ব্ব পারসিকগণ একবার

ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই, বাহ্লীকের গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই, আরবগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিন্ধু-ক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমের মৃত্যুর পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত থাকে নাই। কিন্তু এই সময়ে যেরূপ দৌরাত্ম্য সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে। সুলতান মামুদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধন-সম্পত্তি দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। মথুরার প্রাসাদের আদর্শে গজনি নগর সুশোভিত হয় এবং সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাট গজনির মাহাত্ম্য বিকাশ করে। এপর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থ-বিলুণ্ঠনেই আসক্ত ছিল, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন করে নাই। কিন্তু মহম্মদ গোরী মধ্য এশিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মামুদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যেরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে অথবা নিয়তির অনন্ত শক্তির মহিমায় তাঁহাদের পরাজয় হইল, পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের অনন্ত-প্রবাহ-শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিয়া গেল।

এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্য আরম্ভ হইল, এবং এই সময় হইতে ভারতের এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল। ক্রমে নূতন নূতন বংশের লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন। এই নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্যের প্রাক্কালে রামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব-মত প্রচার করিয়াছিলেন, এক্ষণে উত্তরে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যত্নবান-

হইলেন, এবং মধ্যে কবীর বেদ ও কোরাণ, উভয়েরই বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ঐশ্বরিক তত্ত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছু কাল পরে নদিয়ার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত প্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেম-প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সময়ে ইউরোপে মহামতি লুথর জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্ম্ম জগতে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, যে সময়ে তাঁহার প্রতিভা বলে পঞ্জাবে একটী নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-বিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃশদ্বতীর তটে হিন্দুদের বিজয়-পতাকা ধরাশায়ী হইলে যে নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে, তাহাদের সংশ্রবে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল, বেদের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইল এবং ধর্ম্ম-প্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। তাহাদের মোল্লা, পীর ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে হিন্দুদের দেবতা অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদের পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বর-প্রীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদ-দলিত করিয়া, মহম্মদের ঈশ্বরত্ব ও কোরাণের মাহাত্ম্য প্রচারে উদ্যত হইলেন। ক্রমে নূতন নূতন কুসংস্কার আসিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল, ক্রমে কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তি-জালে জড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ, কিছুতেই তৃপ্তি লাভ না করিয়া, নূতনের জন্য সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময় যিনি ধর্ম্ম-বিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব

গ্রহণ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, এবং রোমের ধর্ম্ম-মত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ এই সময়ে আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন. ধ্যান-ধারণাদি কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না। এই সময়ে তারতুলিয়ান সিসিরোর ন্যায় বাগ্মিতা ও লুকিয়ানের ন্যায় রসিকতা অবলম্বন করিয়া, সকলের সমক্ষে এই উপসনার অসারত্ব প্রতিপন্ন করেন। লোকে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া অন্য কোন অভিনব উপাসনা-পদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। মতের ঘাত প্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-তত্ত্ব ক্রমে লোকের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে লাগিল, এবং প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া পরিশেষে জুপিতরের ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া ছিল। ভারতবর্ষও এইরূপে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্ম-পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া, হিন্দুগণ নূতন নূতন ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কারে অভিনিবিষ্ট হন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটী নূতন রেখা পাত করিয়া দেন। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত নানকের প্রতিভা-গুণে সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন করিয়া যান, নানক তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ সিংহ এই প্রশস্ত ভিত্তি-স্থাপিত প্রশস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ,

স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, এবং সকলের শিরায় শিরায় অচিন্তনীয় উৎসাহ-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন।

নানক যেরূপে জীবন যাপন করেন এবং যেরূপ মত অবলম্বন পূর্ব্বক একটী প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তাহা শিখ জাতির ইতিহাসের একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। নানক শাহ অথবা বাবা নানক ১৪৬৯ খ্রীঃ অব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী কানাকুচা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী। তিনি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানকের বিবরণ অনেক অবাস্তবিক ও কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যিনি যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, মানব-কল্পনা তখনই উচ্চতর হইতেও উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে নানা বিধ ঘটনার প্রচার করিতে থাকে। নানক ধর্ম্মজগতে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে, নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রচারিত হইবে, তাহা বিস্ময় জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্ম-গুরুর মহিমা পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। নানক অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্যে ও সাংসারিক ভোগ-সুখে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসার-ধর্ম্মে আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন, নিজ হইতে ৪০টী টাকা দিয়া তাঁহাকে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া অনাহারী উদাসীন ফকীরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মানুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ইহার পর আপনার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান-বলে উদার ও পরিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত অন্ধ-বিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাঁহাতে

হৃদয়ের শান্তি লাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের সার ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইল। প্লেতো ও বেকন যেমন সমস্ত দর্শনশাস্ত্র আন্দোলন করিয়াও প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে নানাবিধ জঞ্জাল দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়া ছিলেন, নানকও তেমনি সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম-পদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু যোগীদিগের সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের আভাস দেখিতে পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্ম-কাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যা-বৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া, নানক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলার ইরাবতীর তটে "কীর্ত্তিপুর" নামে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক এই ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্যসম্প্র-দায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। ১৫৩৯ অব্দে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমে এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র জীবন-স্রোত অচিন্ত্য, অগম্য, স্বর্গীয় অমৃত প্রবাহে মিশিয়া গেল। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয়-সময়ে প্রাদুর্ভূত হন এবং মোগল বংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার জীবিত কালের ষাটি বৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের প্রবর্ত্তিত উদার ধর্ম্ম পদ্ধতির-পবিত্র আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢ়-কায়, সরল-স্বভাব জাঠগণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে। নানকের একটী বিশ্বস্ত মুসলমান শিষ্যের নাম মর্দ্দানা। এ ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নানকের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদরের চিন্তায় "হা হতোঽস্মি" বলিয়া আক্ষেপ করে, মর্দ্দানাও তেমনি কথায় কথায়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। সংগীত-শাস্ত্রে মর্দ্দা-নার বিশেষ আসক্তি ছিল। সে সর্ব্বদাই বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান করিত। নানক যখন মুদ্রিত নয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ্য জগতের সহিত কোনও সংশ্রব না রাখিয়া যখন প্রগাঢ় রূপে ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট হইতেন,

তখন মর্দ্দানা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও তদগতচিত্তে সুমধুর বীণা-সংযোগে গান গাইত।

যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়, এবং যাহাতে দেশীয় লোকেরা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধু বৃত্তি অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানা জাতিতে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যজ্ঞ যজ্ঞ করা এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়-দমন ও চিত্ত-সংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আত্ম-শুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধ হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানাপ্রকার নহে। তবে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত মাত্র। তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্ন্যাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া, যে ঈশ্বর অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে এবং তৎপ্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন। নানক কহিতেন, ধর্ম্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে। যে জ্ঞান-বলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান। সৎকার্য্য ও সদাচারে সেই এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হওয়া যায়। নানকের মতে সংসার-বিরাগ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গৃহী, উভয়ই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্ম্মানুযায়ি মতের সম্বন্ধে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তি গুলি সুবিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থলে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। একদিন ব্রাহ্মণেরা স্নান করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নানক কহিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি-পুরের ক্ষেত্র পশ্চিম

দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন। এই কথা শুনিয়া সকলে উপহাস পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, কীর্ত্তিপুর বহুশত ক্রোশ দূরে আছে. এই জল কি রূপে ততদুর যাইবে? নানক গম্ভীর ভাবে কহিলেন "তবে তোমরা ইহ লোকে জল সেচিয়া পরলোক-গত পূর্ব্ব পুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?" ১৫২৬ কি ২৭ খৃষ্টাব্দে নানক প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দ্রব্য সামগ্রী বহন করিবার জন্য ধৃত হন। বাবর নানকের আকারপ্রকার, সাধুতা ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক এই দান গ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, "আমার কিছুরই অভাব নহি, আমার সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে, কখনও তাহার হ্রাস হইবে না।" বাবর শাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে নানক স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, তাঁহার হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ান্তরে নানক আর এক বার কহিয়াছিলেন, ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া, তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমুদয়েরই একবারে শান্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল সেই অমৃতেই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন। কথিত আছে, নানক মক্কায় যাইয়া একদিন কাবা নামক উপাসনা-মন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন। ইহাতে পবিত্র মন্দিরের অবমাননাকারী বলিয়া সেখানে তাঁহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্ষুব্ধ হইয়া তত্রত্য মুসলমানদিগকে কহিয়াছিলেন. "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যে দিকে পা ফিরাইব, সেই দিকেই তাঁহার অবমাননা হইতে পারে। এখন কোন্ দিকে পা রাখিয়া নিস্তার পাই, বল।" নানক অন্য সময়ে কহিয়াছিলেন, "এক লক্ষ মহম্মদ, দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং এক লক্ষ রাম, সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন, কেবল ঈশ্বরই অমর। তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লজ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কারের প্রেতাত্মা এখনও সকলকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহার হৃদয় সৎ, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, এবং যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত মুসলমান।" নানক যেরূপ পবিত্র ও উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি যেরূপ সকল স্থলে,

সকল সময়ে অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য তিনি কখন" স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের এক জন দাস ও বিনয়ী আদেশ-বাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ হইলেও তিনি কখনও তাহার উল্লেখ করিয়া আত্মগরিমার বিস্তারে উন্মুখ হন নাই, এবং নিজের ধর্ম্ম-প্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখনও তাহা অমানুষী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন, "ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না', আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্ম-প্রচারকগণের অন্য কোনও অবলম্বন নাই।" গুরু নানক এইরূপে কালান্তরাগত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া, আপনার শিষ্যদিগকে উদার ও পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-পদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটী নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-পরায়ণ বৃহৎ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে "শিখ" শব্দের উৎপত্তি হইল। কেহ কেহ বলেন যে, শিখা-হইতে "শিখ" নাম হইয়াছে। যে সকল পঞ্জাবীর মস্তকে শিখা আছে, অনেকের মতে তাহারাই "শিখ"। যাহা হউক, নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকট এই শিখ নামেই পরিচিত হইতে লাগিল।

দেবর্ষি নারদ একদা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি বল প্রকাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করেন না ত?" নারদের এই উক্তিতে একটী গুরুতর রাজনৈতিক উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দুর্ব্বল সম্প্রদায় নিপীড়িত হইলে ক্রমে আপনার বল সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং এক সময়ে পীড়ন-কারীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করে। এই জন্য দেবর্ষি নারদ উপদেশ দিয়াছেন, রাজা দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যে হেতু দুর্ব্বল নিপীড়িত হইলে ক্রমে সবল হইয়া এক সময়ে রাজার সহিত শত্রুতাচরণে উদ্যত হইবে। অনেক রাজা এই নারদীয় উপদেশে তাচ্ছীল্য দেখাইয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন। ইতিহাস ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ নহে। কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাসে পরিস্ফুট হয়। মুসলমান সম্রাট্গণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দক্ষিণাপথের নিরীহ কৃষাণগণ যুদ্ধবীরের

পদে অধিরোহণ পূর্ব্বক শিবজীর পতাকার অধীনে সজ্জিত হয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তের শিখেরা ধীরে ধীরে মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইয়া উৎপীড়ন-কারী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া উঠে। শিখদিগের এই সমুত্থানের বিবরণ বৈচিত্র্য-পূর্ণ। নানকের মৃত্যুর পর অঙ্গদনামে তাঁহার এক জন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হন। অঙ্গদের পর অমরদাস, রামদাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখ-সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। এপর্য্যন্ত শিখগণ সংযত-চিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহ ভাবে আপনাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ইঁহারা পশুব ন্যায় বধ্য ভূমিতে নীত হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার, অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় সকলের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। শিখ-গুরু বন্দু লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন। অন্যতম গুরু অর্জ্জুনমল মোগল সম্রাট্ জাহাগীরের আদেশে কারাবদ্ধ হইলেন। কারাগারের অসহনীয় যাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণান্তক কুঠারের আঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হইল। অর্জ্জুনের পর তদীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হইয়া মুসলমানদিগের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। এপর্য্যন্ত শিখগণ যে নিরীহ ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, অর্জ্জুনমলের মৃত্যুতে সে নিরীহ ভাব দূর হয়। প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি অম্লান মুখে উত্তর দিতেন, "এক খানি পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপর খানি মুসলমানদিগের শাসনের উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত হইতেছে।" হরগোবিন্দই শিখ-সমাজে অস্ত্র-শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু হরগোবিন্দের অস্ত্রের বলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সংসাধিত হয় নাই। এই অভীষ্ট বিষয়ের সংসিদ্ধির জন্য শিখ-সমাজে আর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখ-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা,

বেদনা-বোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শিখগণ মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্র-দাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সম্বদ্ধ করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভা-বলেই হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহই তাহার মূল। তেজোবত্তা ও মহাপ্রাণতায় শিখ-গুরু-সমাজে গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

এই গোবিন্দ সিংহের জীবনের সহিত শিখদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। ১৬৬১ অব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম তেগবাহাদুর। তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। তরবারির অধিস্বামীকে তেগবাহাদুর বলা যায়। যাহা হউক, হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন। অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তেগবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে যাইবার সময় তেগবাহাদুর স্বীয় তনয় গোবিন্দ সিংহকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বক কহেন "পুত্র! শত্রুরা আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরা-

ধিকারী হইলে। দেখিও মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন শৃগাল কুকুরে নষ্ট না করে, এবং দেখিও এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।” গোবিন্দ পিতার এই শেষ আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হন। তেগবাহাদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করেন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে সম্রাট্ তাচ্ছীল্য ও উপহাস সহকারে তাঁহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তেগবাহাদুর ইহাতে নির্ভয়ে গম্ভীর ভাবে কহেন, “সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনা করাই মানুষের কর্ত্তব্য। তথাপি একটী বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একখণ্ড কাগজে কয়েকটী কথা লিখিয়া গলায় বান্ধিয়া রাখিতেছি। গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে অংশ স্পর্শ না করে।” তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বান্ধিয়া ঘাতকের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। নিমিষ মধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, নিমিষ মধ্যে তেজস্বী শিখ-গুরুর দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগ এবং এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দেখিয়া দিল্লীর ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আওরঙ্গজেব সবিস্ময়ে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে —

“শির্ দিয়া আওর শের্ নেহি দিয়া।”

“মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না।”

এইরূপে ১৬৭৫ অব্দে তেগবাহাদুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল, এই রূপে তেগবাহাদুর আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীর ভাবে ঘাতকের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনী অনন্তকাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তিনি

শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা শুনিয়াছ, আমার পিতা দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন। আমি এখন এই সংসারে একাকী থাকিলাম। কিন্তু আমি যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎ তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কার্য্যে আমি মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিব। পিতার মস্তক এখন দিল্লীতে রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি উহা আনিতে পারিবে না?" গুরুর এই কথায় একটী শিষ্য গাত্রোত্থান করিল এবং তেগবাহাদুরের মস্তক আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ তাহাকে বিদায় দিলেন। শিষ্য দিল্লীতে যাইয়া তেগবাহাদুরের মস্তক লইয়া পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। এ দিকে আওরঙ্গজেবের আদেশে তেগবাহাদুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করা হইল।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, অত্যাচারী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে একভূমিতে আনয়ন করিয়া একটী মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসনকর্তৃগণের সাবধানতা প্রযুক্ত গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া, যমুনার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। এই থানে মৃগয়ায়, পারস্য ভাষা অধ্যয়নে এবং স্বজাতির গৌরব-কাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

মোগল সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব ছলে, বলে, ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটী পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে তৎসমুদয় নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুত রাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র রাজ্য মস্তক-শূন্য হইয়া পড়ে। আওরঙ্গজেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব

রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ অনেকের ভীতি-স্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময় গুরু গোবিন্দ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় ২০ বৎসর যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া, এই শিষ্যদল লইয়া জীবনের মহদ্‌ব্রত সাধনে উদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল। এখন একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার বীজমন্ত্র হইল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত এবং মন্ত্র-সিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গুরুগোবিন্দ এইরূপে প্রবল-পরাক্রম রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং যবন রাজগণের অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানব জাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছার একাগ্রতা ও হৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদন জন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্য-কলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কল্পনা পৃথিবীর শিক্ষা-পথ পরিষ্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইত, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে চেষ্টা পাইত। তিনি শিষ্যদিগকে মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কি প্রকারে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট ও কিরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া, লোকের মনের উপর আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন,

ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং কহিতেন ঈশ্বর কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন; হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন, এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শুনিয়া মহাপ্রাণ হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্ন পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিতেন, এবং যত্ন পূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতা লাভে ঔদাসীন্য দেখান নাই। কথিত আছে, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যাইয়া তিনি অর্জ্জুনের বীর্য্য ও অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্ম-সংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখ-সমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ আপনার মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্থিব ভোগ-সুখে তাচ্ছীল্য দেখাইতে লাগিলেন। অস্থায়ী বিষয়-লালসা—অস্থায়ী ধনসম্পত্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। আপনার বিষয়-নিস্পৃহা দেখাইবার জন্য এবং শিষ্যদিগকে ভোগ-বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্র সাধনে মহাবল করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় ধনসম্পত্তি শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। একদা একজন শিখ সিন্ধু দেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের দুই খানি সুদৃশ্য হস্তাভরণ আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে এই আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অগত্যা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া সেই হস্তাভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণ-শূন্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গোবিন্দ কহিলেন, "একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ইহা শুনিয়া, এক জন ডুবারু আনিয়া তাহাকে কহিল, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ডুবারু সম্মত হইল। শিষ্য কোন্ খানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবারুকে দেখাইয়া দিবার জন্য গুরুকে

বিনয়-নম্রভাব সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "ঐ খানে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য পার্থিব বিষয়ে গুরুর এইরূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণা দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া জীবনের মহদ্‌ব্রত সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দ এইরূপে পার্থিব বিষয়ের মমতা হইতে দূরে থাকিয়া নূতন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্য-দিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কোন রূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌, পরম পিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরল হৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একপ্রাণ ও একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুল-মর্য্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পংক্তিতে এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা কহিয়া, স্বহস্তে এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন ক্ষত্রিয় এবং তিন জন শূদ্র-জাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে "খালসা" অর্থাৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং যুদ্ধ-কার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়-সূচক "সিংহ" উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন জীবনী-শক্তি ও নূতন তেজ সঞ্চারিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্য-কুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, যথানির্দ্দিষ্ট

কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদি গুরু নামক এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া, দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল এবং অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল। "ওয়া গুরুজি কা খালসা! ওয়া গুরুজি কি ফতে! (গুরু কৃতকার্য্য হউন, জয়শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণ-বাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ নামে একটী শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে এই সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সমুদয় কুসংস্কারের মুলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখ-শাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন শিখ-সমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খালসাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ সিংহ আসন্ন-মৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন; এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃহন্তা অত্যাচারী যবন-দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগল-শাসন সর্ব্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎ-পুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের শাহের পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত

হইয়া ষোল বৎসর দেশান্তরে অতিবাহিত করেন। আকবর যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতার বলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সলিমের কঠোর ব্যবহারে এবং বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। জাহাগীর ক্রূর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে কাতর হন নাই। এক সময়ে তাঁহাকে তদীয় কর্ম্মচারী মহব্বৎ খাঁর বন্দিত্বও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শাহজহাঁ আপনার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তনয়দিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখেন, পরিশেষে ইহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে নিরুদ্ধ হন। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি আপনার সন্দিগ্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। একদিকে দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, অপর দিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্ব্বার এই তেজের উৎপত্তি করিয়া, জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য আপনার শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া এক এক দল শিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যদিগের উপর এই সৈন্যদলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া, আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে তিনটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধ করা সুবিধাজনক ভাবিয়া, তিনি এই সকল দুর্গ ও আশ্রয়-স্থান সুব্যবস্থিত করিলেন। এইরূপে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধবীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়া সেনা-নিবাস নিরাপদ করিতে এবং দুর্গ সমূহের শৃঙ্খলা-বিধানে যত্নপর হইলেন।

মোগলদিগের সহিত প্রথম কয়েক যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয় লাভ হইল। কিন্তু শেষ যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ পরাজিত হইলেন। তাঁহার দুটী শিশু পুত্র শত্রুর হস্তে নিপতিত হইয়া নির্দ্দয় রূপে হত হইল। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া, মোগলদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখ-গুরুর তেজস্বিতায় বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে আপনার নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ প্রথমে এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত ঘৃণা সহকারে কহিয়াছিলেন, তিনি সম্রাটের উপর কোন রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এখনও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্ম-সংস্কার, অর্জ্জুন ও তেগবাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এখন কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই, স্থির চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন।" এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দসিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তি হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ গোবিন্দসিংহের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু গোবিন্দসিংহ দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া, জগতের সমক্ষে আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতার সবিশেষ পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আইসে। গোবিন্দসিংহ যখন দক্ষিণাপথে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এক জন পাঠান শত্রু গোপনে তদীয় শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয়। ১৭০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। এই সময় গোবিন্দসিংহের বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

গোবিন্দসিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখ-

গণ মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দসিংহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ ও এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া, নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে, নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা তাঁহার দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে এক সূত্রে নিবদ্ধ করেন, এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্ব সহকারে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে লিখেন, "তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষাবলে চটক পক্ষী শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজোগর্ভ বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

গোবিন্দ সিংহ তরুণ বয়সে নিহত হন। তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয় প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। গোবিন্দসিংহ আপনার মহামন্ত্র সাধনে উদ্যত না হইলে শিখদিগের নাম বোধ হয় ইতিহাস হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইত। গোবিন্দসিংহ এই অল্পবয়সে ও অল্প সময়ের মধ্যে শিখ-সমাজে যে জীবনী শক্তি ও তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই বলে নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস-হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। গোবিন্দসিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তির বিলয় হয় নাই। যখন জন-কোলাহল-পূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজ-প্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব

ও অদীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয়-পতাকায় পরিশোভিত রহিবে, যখন তরঙ্গাবর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ ভীষণ-মূর্ত্তি তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া ভৈরব রবে জলধি উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও উদারতা পৃথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দসিংহের পবিত্র নাম পবিত্র জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। সম্রাটের পর সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন, জনপদের পর জনপদ দিল্লীর অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইতে থাকে, শাসন-কর্ত্তার পর শাসন-কর্ত্তা সম্রাটের আদেশে তাচ্ছীল্য দেখাইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্রিয় নিকেতন—বিচিত্র আমখাসের লীলা-ভূমি সুশোভন দিল্লী মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হয়। ইহার পর দোর্‌রাণী ভূপতি অহম্মদ শাহ আপনার সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হন। ইঁহার পরাক্রমে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মর্‌হাট্টাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। দিল্লীর সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীন ভাবে বিহার প্রদেশে আসিয়া উপনীত হন। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে—বিলুণ্ঠন, বিপ্লাবন ও বিধ্বংসের ভয়াবহ রাজ্যে শিখগণ আপনাদের জাতীয় তেজস্বিতা অক্ষত রাখিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার আবির্ভাব হইতেছিল। তাহারা এই সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার অধীনে সজ্জিত হইয়া আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্র-চালনায় তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসাদিগের মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্য থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্র-সঞ্চালনে ও অশ্বারোহণে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। ক্রমে খালসারা অনেক দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলের এক একজন সর্দ্দার এক একটী নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমস্ত শিখ জনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যে

বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ব্বাংশে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। খালসারা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও পবিত্র ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্ছেদ্য জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বৎসর অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া আপনাদের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইঙ্গরেজ বণিকেরা দক্ষিণাপথে ফরাসী-দিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, একজন বর্ষীয়ান্ দরিদ্র মুসলমান সৈনিক পুরুষ মহীসূরের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের গভীর রেখাপাত করিতেছিলেন, তখন শিখদিগের খণ্ড রাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে শিখেরা আবার মহাবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। ইঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্তৃত্ব করিতেন। রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণ-পাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হয়, এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে "কাণা রণজিৎ" নামে প্রসিদ্ধ হন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হন। রণজিৎ খর্ব্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি এই বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোর্-রাণী ভূপতির আধিপত্য ছিল। ইঙ্গরেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার বল সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতা-স্পর্দ্ধী হইয়া উঠিতেছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইহাঁদের মধ্যে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। তিনি অহম্মদ শাহ

দোর্‌রাণী পৌত্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে সমস্ত মণ্ডল তাঁহার আয়ত্ত হইয়া উঠে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সমস্ত পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সিন্ধুনদ উত্তরণ পূর্ব্বক আফগানিস্তানে জয়-পতাকা উড্ডীন করেন। এইটি শিখদিগের ইতিহাসে একটী প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। যাহারা দৃশদ্বতী নদীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করে, শিখেরা তাহাদের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। এক দিকে দীর্ঘকায়, ভীমমূর্ত্তি আফগান জাতি, অপর দিকে সাহসী, যুদ্ধ-কুশল শিখ সৈন্য। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নৃপতি এই শেষ বার সিন্ধু নদের অপর পারে হিন্দু বিজয়ী পাঠানের শোণিত-জলে পৃথ্বীরাজ ও সমরশীর আত্মার পরিতর্পণ করিতে উপস্থিত। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? এ মহাশ্মশানে কে এই মহাবীরের মহাকীর্ত্তির কাহিনীতে কর্ণপাত করিবে? মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মহোল্লাসে পঞ্চনদে প্রত্যাবৃত্ত হন। নওশেরার সংগ্রামে শিখেরা যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করে, তাহাতে সমগ্র আফগানিস্তান বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহ জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে এইরূপ দুর্জ্জেয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, আর তাঁহার যুদ্ধ-কুশল সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তিনি মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই।

রণজিতের জীবনী-লেখক বলিয়াছেন, 'রণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মতই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।' এই সিংহবিক্রম মহাবীরের সমস্ত কথা এস্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করা সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা যথানিয়মে সুশিক্ষা পাইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষের তুলনা করাও

উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্যের প্রদত্ত শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই। এগুলি অপনা হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ আপনার এই স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জগতের মধ্যে মহৎ লোকের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। আপনার সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও রণ-পারদর্শী করা তাঁহার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ফরিদখাঁ সুব একাকী ব্যাঘ্র বধ করিয়া শের শাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অস্তাজিলো এক সময়ে এইরূপ সাহস দেখাইয়া, শের আফগান নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুললাবণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই দুই বীরের এই সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ সৈন্য মৃগয়ার সময় একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে ; তাহারা অশ্বারোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে এবং শত্রুপক্ষের ব্যূহ-ভেদে পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধ-বীরের তুল্য যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে।

বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ বীর-লীলাস্থল ভারতের যথার্থ বীর পুরুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় বীর পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ যখন তিরৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠানদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তটে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরত্বে শত্রুর হৃদয়েও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, অদীনপরাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভারতের থর্ম্মাপলী—পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াও ধীর গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে," তখন তাঁহার লোকাতীত মহাপ্রাণতা এবং স্বদেশের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্ম্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছিল, আবার মহাবিক্রম শিবজী যখন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে যাইয়া, বিজয়-ভেরীর

গম্ভীর নিনাদে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটও তাঁহার অপূর্ব্ব দেশভক্তি ও অপূর্ব্ব বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীর পুরুষগণের অনন্ত মহিমায় মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া এক সময়ে এই বীর পুরুষগণের অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী ঘুষিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ব-বৈভব শিবজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্য্য-বহ্নির উজ্জল স্ফুলিঙ্গে ভারতের যবন রাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই মহাশক্তির ভক্ত শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া যায় নাই। শিবজীর পর গুরুগোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া, রণজিৎ-সিংহ আবার ভারতে এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আবার চারি দিকে বীরত্ব-মহিমা প্রসারিত করিয়া ভৈরব রবে চারি দিক মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

পঞ্জাব-কেশরীর পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিখদিগের জাতীয় স্বাধীনতার অধোগতির সূত্রপাত হয়। গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে দীক্ষিত এবং রণজিৎ সিংহের শাসনে পরিচালিত এই মহাজাতির শোচনীয় পরিণামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর লাহোর-দরবার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। রাজ্য মধ্যে নরহত্যা সঙ্ঘটিত ও নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এক জনের পর আর এক জন লাহোরের গদিতে অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন। অবশেষে রণজিৎ-মহিষী মহারাণী ঝিন্দন আপনার শিশু পুত্র দলীপ সিংহের নামে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় শিখদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটীশ সেনানায়কদিগের অসীম চাতুরীর প্রভাবে এবং আপনাদের সেনাপতিগণের অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্বাস-ঘাতকতায় শিখেরা পরাজয় স্বীকার করে। আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। কোন কোন সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বিদেশীর হস্তে পড়িয়া ভারতীয় ইতিহাস অনেক স্থলে কলঙ্কিত এবং অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ-তার মধ্যেও দুই এক জন অপক্ষপাত লেখকের সত্য-নিষ্ঠায় প্রশস্ততার

সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। যদি এইরূপ অপক্ষপাত ও উদার-স্বভাব ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অসঙ্কুচিত-চিত্তে নির্দ্দেশ করিবেন যে, স্বজাতি-দ্রোহী রাজা লাল সিংহ ও সর্দ্দার তেজ সিংহ গোপনে কাপ্তেন নিকলসন্ ও কাপ্তেন লরেন্সের সহিত ষড়যন্ত্র না করিলে প্রথম শিখ-যুদ্ধে রণজিতের সুশিক্ষিত খালসা সৈন্য ব্রিটীশ সেনার নিকট মস্তক অবনত করিত না *। এই যুদ্ধের পর ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহোর-দরবারের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ব্রিটীশ রেসিডেন্টের সাহায্যে সমুদয় শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বন্দোবস্ত হয়। মহারাজ দলীপ সিংহ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক হন। উপস্থিত সময়ে মহারাজ দলীপ সিংহের অবস্থা অনেকাংশ মিশরের খেদিবের অবস্থার অনুরূপ ছিল। টিউফিক্ পাশার ন্যায় দলীপসিংহও ভিন্নদেশীয়-দিগের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন; আরাবি পাশা যেমন স্বদেশের উদ্ধার সাধন জন্য অস্ত্র ধারণ করেন, পঞ্জাবের একটী বীর পুরুষও তেমনি গরীয়সী জন্ম-ভুমির বিমুক্তির জন্য অসি হস্তে করিয়া বিদেশীয়দিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সন্ধির পর অদম্য ব্রিটীশ সিংহ ক্রমেই পঞ্জাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সপ্ত সিন্ধুর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাঁহার ভোগ-লালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। দলীপ-জননী ঝিন্দন সাতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পর-

---

* যখন শিখ সৈন্য ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লাল সিংহ তত্রত্য এজেণ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে ক্রটী করেন নাই। ইঙ্গরেজ-পক্ষের উৎকোচে এইরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া লাল সিংহ ফিরোজ সহরের যুদ্ধে প্রথমেই পলায়ন করেন। এই সময়ে সর্দ্দার তেজসিংহ ২৫ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেও অল্পসংখ্যক পরিশ্রান্ত ব্রিটীশ সৈন্য আক্রমণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত লাল সিংহ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরস্ত হন। অধিকন্তু তিনি ১৮৪৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাপ্তেন লরেন্সের নিকট সোব্রাও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্বীয় সৈন্য-নিবেশের বিবরণ পাঠাইয়া দেন। Cunningham, "History of the Sikhs," p. 269-299. Calcutta Review June, 1149. p. 549-550.

পদানত হইয়াছে, পর জাতি "সাত সমুদ্র তের নদীর" পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটীশ কোম্পানীর মুল্লুক হইয়া যাইবে; দেখিলেন ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট, ইহার মধ্যেই পঞ্জাবের সমুদয় রাজকীয় কার্য্য আপনাদের আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, অধিক কি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে ক্রীড়া-পুত্তল স্বরূপ করিতেও ক্রটী করেন নাই। বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা—এই অনধিকার-প্রিয়তায় ঝিন্দন দুঃখিত হইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল। ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট হেনরী লরেন্স্ এই তেজস্বিনী নারীকে লাহোর হইতে শেখপুর নামক নির্জ্জন স্থানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইঙ্গরেজ ইতিহাস-লেখকগণ কহিয়াছেন, ঝিন্দন গোপনে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করাতে তাঁহার এই রূপ দণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু যথানিয়মে এই অপরাধের বিচার করা হয় নাই। রেসিডেণ্ট বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া দলীপ সিংহের মাতাকে শেখপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষে মহারাণী ঝিন্দন এই শেখপুরেও দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেডরিক কারি তাঁহাকে একবারে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপসিংহ রেসিডেণ্টের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন, সুতরাং স্যার ফ্রেডরিক কারির অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। অবিলম্বে ঝিন্দনের নিষ্কাশন-লিপি দলীপসিংহের নামাঙ্কিত মোহরে শোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্ম্মচারী দুই জন ব্রিটীশ সৈনিক পুরুষের সহিত এই লিপি লইয়া শেখপুরে ঝিন্দনের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত নির্ব্বাসন-দণ্ড-লিপির নিকট মস্তক অবনত করিলেন, অটলভাবে স্বীয় দুরদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিয়া, চিরজীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যে পঞ্চনদ তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এত দিনের পর সেই পঞ্চনদ তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। প্রথমে তাঁহাকে ফিরোজপুরে আনিয়া পরিশেষে বারাণসীতে উপস্থিত করা হয়। মহারাণী ঝিন্দন, হিন্দুর আরাধ্য ক্ষেত্রে—হিন্দু-

ত্ত্বের নিদর্শন-ভূমি কাশীধামে উপনীত হইয়া মেজর জর্জ্জ ম্যাক্‌গ্রেগর নামক এক জন সৈনিক পুরুষের প্রহরিতায় পরিরক্ষিত হন।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন-ব্যাপার সম্পন্ন হইল। পঞ্জাব ধীর জলধির ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিল। একটী মাত্রও বারি-বিন্দু তাহার নেত্র হইতে বিগলিত হইল না, যে বহ্নি তাহার হৃদয়ের প্রতি স্তর দগ্ধ করিতেছিল, এসময়ে তাহার একটী স্ফুলিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না। পঞ্জাব যোগ-নিদ্রাভিভূত বিরাট্ পুরুষের ন্যায় জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণবিশিষ্ট নহে, এই নির্জ্জীবত্ব প্রকৃতি নির্জ্জীবত্বের পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা। দলীপসিংহ সুখময় বাল্য-লীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন. জননীর শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। ভবিষ্য জীবন ভবিষ্য সংসার-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বালক রেসিডেণ্টের মহামন্ত্রে মোহিত হইয়া অম্লান বদনে, অতল অনন্ত সাগরে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর বিসর্জ্জন দেখিল। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘ-কাল নিস্তেজ অবস্থায় থাকে নাই, যে অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্য ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিবলে অবিলম্বে এই জড়ত্ব সজীবতায়, এবং এই নিগূঢ় তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের কিছুকাল পরেই সমস্ত পঞ্জাব অদৃষ্টচর মন্ত্রশক্তি-বলে, অপূর্ব্ব জাতীয় জীবনের মহিমার প্রসাদে এই সংহারিণী ব্রিটীশ নীতির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন ব্যতীত আরও দুইটী কারণে শিখেরা ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই কারণদ্বয়ের একটী দলীপসিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে ব্রিটীশ রেসিডেন্টের অসম্মতি, অপরটী বৃদ্ধ শিখ-সর্দ্দার ছত্র সিংহের অপমান। সর্দ্দার ছত্র সিংহ হাজরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ বলিয়া শিখ-সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র সেনাপতি শের সিংহও উদার-প্রকৃতি ও রণ-বিশারদ ছিলেন।

মহারাজ দলীপসিংহের সহিত এই সর্দার ছত্র সিংহের দুহিতা অথবা শেরসিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। মেজর এড্ওয়ার্ডিস্ নামক একজন সহৃদয় সৈনিক পুরুষ উপস্থিত বিবাহের সম্বন্ধে লাহোরের রেসিডেণ্টকে লিখেন, "এখন সকলেই প্রকাশ করিতেছে, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলযোগ ও সৈন্যগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন। এই সময়ে যদি মহারাজকে একটী মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্ধি রক্ষা করিতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের যত্ন আছে বলিয়া সাধারণের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ লোকের মন আশ্বস্ত হইবে।" স্যার ফ্রেডরিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন, স্বীকার করিলেন, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মহারাজ, তাঁহার বিবাহ-পাত্রী এবং তৎপরিবার-বর্গের সম্মান ও সুখ বৃদ্ধি করিতে বিলক্ষণ উৎসুক আছেন। কিন্তু তিনি যে কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। কূটমন্ত্রণাপর রেসিডেণ্ট অবশেষে লিখিলেন, "দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, পঞ্জাবে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যাপক্ষ ও দরবারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে, এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই।"

যাঁহারা সরল-প্রকৃতি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাঁহাদের সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা আপনাদের ন্যায় রেসিডেণ্টের এই লিখন-ভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির রহস্য ভেদে সমর্থ, যাঁহাদের মস্তিষ্কের সজীবতায় মণ্ডলেশ্বর রাজ-চক্রবর্ত্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বিরাগী উদাসীন বেশে বনে বনে বেড়াইতেছেন, পক্ষান্তরে সংসার-বিরাগী উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজ-চক্রবর্ত্তীর পদে সমাসীন হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন দণ্ড চালনা করিতেছেন, তাঁহারা অনায়াসেই এই লিপিতে বুঝিতে পারিবেন যে, রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া তেজস্বী শেরসিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিতে সম্মত নহেন, বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর

দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখ-হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবি। আজ যাহা রণজিৎ-রাজ্য বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে, কাল তাহা ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্রিটীশ ভাব, ব্রিটীশ আচার ও ব্রিটীশ নীতির ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইবে।

এ দিকে রেসিডেণ্টের আদেশে সর্দ্দার ছত্র সিংহের জাইগীর বাজেয়াপ্ত করা হইল। তিনি অপমান ও দুরবস্থার একশেষ ভুগিতে লাগিলেন। স্বদেশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনে, বৃদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে শিখ সেনাপতি মহাবীর শের সিংহের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্র পূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিলেন। এইরূপে ইঙ্গরেজদিগের সহিত আবার শিখদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথম রামনগরের যুদ্ধে ইঙ্গরেজ সৈন্য পরাজিতপ্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিল। ইহার পর শের সিংহ চিলিয়ানওয়ালায় যাইয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। ১৮৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি ভারতের একটী পরম পবিত্র দিন। এই দিনে শিখেরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য চিলিয়ান-ওয়ালার ক্ষেত্রে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বিজয়শ্রীর অধিকারী হয়, এই দিনে মহাবীর শের সিংহের পরাক্রমে ব্রিটীশ সেনাপতি লর্ড গফ্ পরাজিত হন, এই দিনে ব্রিটীশ পতাকা শিখদিগের হস্তগত, ব্রিটীশ কামান শিখদিগের অধি কৃত, ব্রিটীশ অশ্বারোহী শিখদিগের বিক্রমে পলায়িত এবং ব্রিটীশ পদাতিক-শিখদিগকর্ত্তৃক পরাভূত হয়। সেনাপতি শের সিংহ এই দিনে বীরত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া তোপ-ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত করেন; যাঁহারা অলোক সামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে হৃতসর্ব্বস্ব ও হৃতগৌরব করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা এই দিনে আর্য্য-তেজ, আর্য্য-সাহস ও আর্য্য-বীরত্বের নিকট মস্তক অবনত করেন। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এইরূপ লোকা-তীত বীরত্বের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণতরঙ্গায়িত গ্রীশের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় গ্রীক সেনাপতিদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতবর্ষের থর্ম্মাপলী, আর এই চিলিয়ানওয়ালা, ভারতবর্ষের মারাথন। মিবারের প্রতাপ সিংহ

ভারতের লিওনিদস্, আর পঞ্চনদের এই শের সিংহ ভারতের মিলতাইদিস। যদি কোন মহাবীর বীরেন্দ্র-সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ অলোকসামান্য দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরাদিগের বীণা-নিন্দিত মধুর স্বরে স্তত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই লিওনিদস ও মিলতাইদিস, আর এই প্রতাপ সিংহ ও শের সিংহ। চিলিয়ানওয়ালা উনবিংশ শতাব্দীর একটী পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল লীলা করিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। শের সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র-সমাজের প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন, এবং পবিত্রতর হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

চিলিয়ানওয়ালার পর গুজরাটের যুদ্ধে শের সিংহের পরাজয় হয়। শিখ সর্দারেরা পরাজিত হইলেও হৃদয়ের তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিখগুরু ব্রিটীশ সেনাপতি স্যার ওয়াল্টর্ গিলবার্টের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে গম্ভীরোন্নত স্বরে কহেন, ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার প্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আমরা স্বদেশের জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। এখন আমাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ান হইয়াছে। আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র, সমস্তই হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে কালেও তাহা করিব।” এইরূপ তেজস্বিতার সহিত বৃদ্ধ শিখ-সর্দ্দারগণ একে একে আপনাদের অস্ত্র ভূমিতে রাখিলেন। পরে সকলেই গম্ভীর স্বরে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, “আজ হইতে মাহারাজ রণজিৎ সিংহের যথার্থ মৃত্যু হইল।” কিন্তু এই তেজস্বিতা এবং এই স্বদেশ-বৎসলতার সম্মান রক্ষিত হইল না। যে সকল শিখ গুজরাটের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল; তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-স্রোতে বীরত্বের সম্মান, বীরত্বের আদর, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যুদ্ধের পর লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া

ইলিয়ট সাহেবকে প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোর-দরবারে পাঠাইয়াদিলেন। স্যার ফ্রেডরিক কারির কার্য্য-কাল শেষ হওয়াতে স্যার হেন্‌রী লরেন্স্ পুনর্ব্বার রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ২৮এ মার্চ্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য ব্রিটীশ কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর দিন (২৯এ মার্চ্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বার পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটীশ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অবিচার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া শিখ-রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডালহৌসীর ঘোষণা-পত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিতের দুর্গে ব্রিটীশ পতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য সফল হইল। পঞ্জাব ডালহৌসীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজনীতির প্রভাবে ভারতের মানচিত্রে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল*। মহারাজ দলীপসিংহ বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া পঞ্জাব হইতে অপসারিত হইলেন। আর যে লোক-প্রসিদ্ধ কহিনুর হীরক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লবে মহারাজ রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ সিংহ যাহা অতি গৌরবে বাহুতে ধারণ করিতেন, ডালহৌসী "পাঁচ জুতি" † মূল্য দিয়া তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহ হইতে গ্রহণ করিলেন।

---

* একদা মহারাজ রণজিৎসিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে ইঙ্গরেজীতে ব্যুৎপন্ন একজন শিখকে মানচিত্র-স্থিত লাল রঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কহিলেন, যে সকল স্থান ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত, তৎসমুদয় লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে। রণজিৎসিংহ অমনি কহিয়া উঠিলেন 'সব লাল হো জায়েগা' অর্থাৎ কালে সমুদয়ই ইঙ্গরেজদিগের অধিকার হইয়া যাইবে।

† কহিনুরের ইতিবৃত্ত বড় অদ্ভুত। কিংবদন্তী অনুসারে এই মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপরে ইহা উজ্জয়িনী-রাজের

রাজ্যচ্যুতির সময় দলীপ সিংহের বয়স বার বৎসর ছিল। তিনি এই সময়ে স্যার জন লজিন্ নামক এক জন ইঙ্গ্রেজের শিক্ষাধীন হন। শিক্ষক স্বীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পঞ্জাব-কেশরীর পুত্র এখন ইঙ্গ্লণ্ডের সামাজিক-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট আছেন। আর মহারাণী ঝিন্দন? যাঁহার নির্ব্বাসনে প্রভুভক্ত খালসা সৈন্য উন্মত্ত হইয়া ভীষণ অনল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি স্বীয় অবস্থার বহুবিধ পরিবর্ত্তন পরে, বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া, ইঙ্গ্লণ্ডে পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধি-বেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট মহিষীর জীবন-স্রোত অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়া গেল।

এই রূপে শিখ-রাজ্যের অবস্থান্তর ঘটিল। আদি গুরু নানক আপনার লোকাতীত সরলতা ও নিষ্ঠার গুণে যে স্থানে একটী পবিত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ যে স্থানের যোগাসনে সমাসীন হইয়া স্বাধীনতার প্রাণ-রূপিণী পরমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন, রণজিৎ সিংহ যে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, আপনার অসাধারণ ক্ষমতার মহিমায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা পর-হস্ত-গত হইল। পঞ্জাব-কেশরীর পঞ্চনদ আজ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত, দেব-বাঞ্ছনীয় কহিনুর আজ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের মধ্যে পরিগণিত, অতুল ধনসম্পত্তি-পূর্ণ বেদ-কীর্ত্তিত পবিত্র ভূমির অধিপতির পুত্র আজ ব্রিটীশ সিংহের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে সে গৌরব,

---

শিরোভূষণ হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ অধিকার করিয়া ইহা লাভ করেন। পাঠান রাজত্বের ধ্বংস হইলে এই মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর, নাদির শাহ দিল্লী-আক্রমণ সময়ে ইহা গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের অহম্মদ শাহ ইহা প্রাপ্ত হন। ক্রমে এই মণি শাহসুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহসুজাকে পরাজিত করিয়া ইহা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা ব্রিটীশ রাজ-প্রতিনিধি কহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে রণজিৎ সিংহ হাসিয়া কহিয়াছিলেন "এস্‌কো কিমৎ পাঁচ জুতি" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

সে মহত্ত্ব সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যবন-রাজ-দিগকে পরাভূত করিয়া যে বিশাল রাজ্যে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়াছিলেন, সে রাজ্য আজও ভারতের মানচিত্রে শোভা পাইতেছে। যে সপ্তসিন্ধুর মনোহর তটদেশ শিখদিগের বিজয়-পতাকায় শোভিত থাকিত, সে সপ্তসিন্ধু আজও অবিরামগতি প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু আজ সে পবিত্র কালের অপূর্ব্ব লীলা-বিভ্রম নাই। সে কাল চিরদিনের জন্য অপার অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু সহৃদয়দিগের স্মৃতি হইতে—পবিত্র ইতিহাসের হৃদয় হইতে শিখদিগের মহাপ্রাণতা ও শূরত্বের কাহিনী কখনও স্খলিত হইবে না। এই কাহিনী অনন্ত কাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে। যদি ভারত-মহাসাগরের অতল জলে সমস্ত ভারতবর্ষ নিমগ্ন হয়, যদি হিমালয়ের অভ্র-ভেদী শৃঙ্গপাতে ভারতের সমস্ত দেহ সন্তাড়িত, নিষ্পেষিত ও বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলেও শিখদিগের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় থাকিবে, তাহা হইলেও গুরু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ সিংহ এবং শের সিংহের যশোগান এক সময়ে পৃথিবীর কোটী কোটী জীবের হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইবে।

সম্পূর্ণ।

Printed by Sarachchandra Deva at the Vina Press,
37 Machuabazar Street—Calcutta.